নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা

শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর

(৩)

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন ঘরের দরজা বন্ধ করে মা ভবতারিণীকে প্রশ্ন করছেন — ''আচ্ছা মা! এরা যে আমার কাছে আসচে এরাও ত তোরই ছেলে? তবে আমার সঙ্গে যেমনভাবে কথা বলছিস্, আমার সব কথারই উত্তর দিচ্ছিস্, তাদের এমনি করে দেখা দিস্না কেন? এমনিভাবে কথার উত্তরই বা দিস্না কেন? এতে লোকেত তোকেই দোষ দেবে? তুই ওদের কাছে পুতুল সেজে থাকিস্ আর আমার কাছে মানুষের মত কথা কস্, এ তোর কোন দেশী বিচার মা!''

মা ভবতারিণী উত্তর দিলেন — ''ওদের সঙ্গে ত আমি কথা কই, দেখা দিই কিন্তু ওরা আমার কথা শুনতেও পায় না আর দেখতেও পায় না। ওরা কালা হ'য়ে থাকে তাই কালী মায়ের কথা শুনতে পায় না। কোন পড়ুয়া ছেলের কানের কাছে ঢাক বাজলেও যেমন সে শুনতে পায় না, ওরাও তেমনি বিষয়-বাসনার আকর্ষণে এত তন্ময় হয়ে থাকে যে, আমার কথা শুনতে পায় না। তোর মত ওদেরও যখন কানের চাপা খুলে যাবে, তখন ওরাও তোরই মত আমার কথা শুনতে পাবে। সেইজন্য তোর দ্বারায় আমি ওদের দেখাব যে, আমি সবারই সঙ্গে কথা বলি, সবাইকে আমি দেখা দি।''

রামকৃষ্ণদেব—''ওদের আমি বলি যে, আমি মায়ের সঙ্গে কথা কই; কিন্তু নরেন ছাড়া ওরা আমার কথা বিশ্বাস করে নিতে পারে না; তা নরেনকে তুইত দেখা দিতে পারিস্, ওর যখন খানিকটা বিশ্বাস হয়েছে, তখন ওকে দেখা দিলে ক্ষতি কি মা?''

মা ভবতারিণী—''নরেন তোর দরজার গোড়াতে বসে রয়েছে, সারারাত্রি তোরই মূর্ত্তি দর্শন করেছে; তাই ভোরে উঠেই হাঁটতে হাঁটতে তোরই দর্শনে ছুটে এসেছে, তুই দরজা খুলে ওকে ঘরের মাঝে ডেকে নিয়ে আয়।''

রামকৃষ্ণদেব—''তা আমি খুলে দিচ্ছি কিন্তু ওকে দেখে লুকিয়ে পড়িস্নে, তোর এমন দেবীরূপ একবার ওকে দেখতে দে'মা!''

মা ভবতারিণী—''তুই বড্ড বোকা ছেলে। আরে চোখের ঠুলি না খুল্লে দেখবে কেমন করে? তোকে ওসব কথা ভাবতে হবে না; আজ তুই ওকে কেবল বলবি যে, মায়ের কাছে এসে কিছু একটা নূতন খাবার চেয়ে নে — ওকে যে কোন একটা ফলের নাম করতে বলবি, যা এ সময়ে পাওয়া যায় না। যে ফলেরই নাম সে করবে, আমার শাড়ীর পেছনেই তা রাখা থাকবে, তুই তখনই সেটা নিয়ে ওর হাতে দিবি, তা'হলেই ওর প্রিয়ভাব আর ভক্তিভাব অনেকখানি বেড়ে যাবে — বুঝলি?''

এ কথায় রামকৃষ্ণদেব চোখের জল মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ালেন আর সঙ্গে সঙ্গে আঁট সাঁট দরজাটা খুলে গেল। নরেন দরজা ধরে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ঘরের মধ্যে সশব্দে রামকৃষ্ণদেবের পায়ের কাছেই পড়ে গেলেন।

পড়ার শব্দের সাথে সাথে কে যেন বলে উঠলো—''কী হলরে?'' ধাক্কা খেয়ে নরেন মুহূর্ত্তের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,''মন্দিরে আপনার সাথে আর কি কেউ আছেন? নারীকণ্ঠে, কাতর-কণ্ঠে, কে এ কথা বলে উঠলেন?''

রামকৃষ্ণদেব চোখের জলে বুক ভাসিয়ে উত্তর দিলেন— ''আমার কণ্ঠধ্বনি যখন নয়, তখন এখানে এক মা ছাড়া আর কে থাকতে পারে?''

বিবেকানন্দ বিমুগ্ধ স্বরে বললেন—''না, আমি তা বলছি না। আমি স্পষ্ট সারদা মায়ের কণ্ঠধ্বনি শুনলুম, তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি; তিনি এখানে না থাকলে তাঁর কণ্ঠধ্বনি কে শোনাল?''

রামকৃষ্ণদেব—''দেখছিস্না, মা দাঁড়িয়ে তোর কথা শুনে হাসছেন। এই জন্যই মা এখুনি বলছিলেন, চোখের ঠুলি না

খুললে তোকে খুশী করা যাবে না। আয় ত, মায়ের চরণ-ধোয়া

জলে চোখটা মুছে দিই—ইস্ মায়ের চরণধোয়া জলটাকেও তুই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিস্! থাক্‌গে, এই গঙ্গাজল দিয়েই তোর চোখ ধুয়ে দিই''—

এ কথায় স্বামীজী রামকৃষ্ণদেবের পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়ে, উত্তর দিলেন, ''আমি রাশি রাশি গঙ্গাজলে চোখ ধুয়েছি কিন্তু কোনদিন তোমার মাকে দেখিনি, কেবল তোমাকে দেখেছি। তবে তোমার ছোঁয়া গঙ্গাজল যদি সুরধুনীর জল হয়ে যায়, তবে হয়ত কিছুটা ফল, ফলতে পারে।''

এ প্রশ্নে রামকৃষ্ণদেব বলে উঠলেন—''হাঁ হাঁ, মায়ের আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল—এই সময় কিছু অসময়ের পাকা ফলের কথা বলতে পারিস? আজ তোকে আমি তাই খাওয়াব—যে কোন একটি পাকাফলের নাম কর যা, এসময় সারা বাংলাদেশেও পাওয়া যাবে না।''

কথা শুনে বিবেকানন্দ খানিকটা বুদ্ধিভ্রষ্টের মত বলে ফেললেন —''খেজুর। ''

রামকৃষ্ণদেব—''পাকা খেজুর? আরে এখনত সারা বাংলাদেশেই পাকা খেজুর পাওয়া যায়, তবে আর নূতন ফলের কথা কি জানালি?''

স্বামীজি লজ্জিত হয়ে বললেন—''তোমার কাছে এসে আমার সবই ভুল হয়ে যায়, দাঁড়াও আমি একটু ভেবে বলছি''—ভাবা হলনা—নরেনের চোখের জলে রামকৃষ্ণদেবের পা ভিজে গেল স্বামীজি কেঁদে কেঁদে শুধু রামকৃষ্ণদেবের পা দুটো জড়িয়ে ধরে আকুল প্রার্থনায় গেয়ে উঠলেন—

''দাও প্রেম, দাও ভক্তি, জীবে দয়া
রামকৃষ্ণ নাম ছড়াও বিশ্বে ভিজুক সবার হিয়া।''

রামকৃষ্ণদেব খাণিকক্ষণ পর বিবেকানন্দকে বললেন—''মায়ের লীলাখেলা বুঝিনা; মা আমাকে হুকুম করলো—নরেন এসেছে, দরজা খুলে দে। আমি উঠে দাঁড়ালুম দরজা খুলতে কিন্তু তার আগেই দেখলুম দরজাটা যেন মায়ের হুকুম শুনতে পেয়ে নিজেই মায়ের আজ্ঞা পালন করে ফেললো। এখানে সবাই যেন মায়ের এক একটি জীবন্ত প্রতিমা। এমন কি এই চন্দন সেটাও যেন আপনা আপনিই চন্দন সাজে সেজে থাকে, আমায় চন্দনটি পর্য্যন্ত ঘষতে হয় না, মায়ের চরণে বেলপাতা দেবার আগেই ওরা উড়ে গিয়ে মায়ের চরণে হাজির হয়। দরজাটা যদি মায়ের শক্তি না পেতো, তবে কি তুই ওখানে দাঁড়িয়ে থেকেই ঘুমিয়ে পড়তিস? এখানকার প্রতিধূলিকণাটিও এক একটি প্রতিমা। তুই কিছু প্রসাদ খাবি? আজ তুই যে কোন প্রসাদীবস্তুর নাম করবি, আজ তোকে সেই জিনিষই মায়ের কোল থেকে এনে দেবো।''

নরেন কোন উত্তর দিতে পারলেন না। শুধু রামকৃষ্ণদেবের পায়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে মনে বললেন—''তোমার চরণ চাইলে সব খাওয়া-পাওয়ার কথাই ভুল হয়ে যায়, তবু অহংএর যেটুকু কণা পড়ে থাকে তাই দিয়ে, তোমায় বলি, মায়ের কোল থেকে রূপোর কোশাকুশী হ'তে হিমগিরির ঠাণ্ডা জল এখন পান করাতে পার?''

রামকৃষ্ণদেব সজল চোখে উত্তর দিলেন— ''হ্যাঁ হ্যাঁ, তাও পারি; তুই একটু পূর্বমুখো হয়ে ব'স, আমি এখনই মায়ের কোল থেকে কোশাকুশীর হিমালয় জল এনে দিচ্ছি।''

স্বামীজি ছবির মতই বসে রইলেন। সজল চোখ আরও ভারী হয়ে উঠলো।

রামকৃষ্ণদেব—''এই নে, দেখ্‌লিত, মায়ের কোল থেকেই এই ঝিলিক্‌মারা আর বিজলীপরা কোশাকুশী পেলুম। চোখ চেয়ে দেখ, এটা কত কন্‌কনে ঠাণ্ডা! কিন্তু কইরে, এতে জল কোথা? এ'ত দেখছি, মায়ের দুটো সজল চোখ মাত্র। মায়ের বাঁ চোখটা হয়েছে কোশা আর ডান চোখটা হয়েছে কুশী। ঠিক যেন লবকুশের মত আমার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। কিন্তু তাঁর হুকুম মত সবই পেলুম, হিমালয়ের হিমগিরি কন্যাও হাতে এলো, এত বরফ-স্তূপের মত কন্‌কনে যে, আমি হাতের মাঝে রাখতে পারছি না; কিন্তু জল কই? জলটা কি বরফ হয়ে এতেই জমে আছে নাকি?''

স্বামীজি বিস্ময় চোখের দৃষ্টি ফেলে সজল চোখে উত্তর দিলেন—''এমন অপূর্ব্ব ও ক্ষুদ্র কোশাকুশী যে, এ জগতের কোন মন্দিরে থাকতে পারে, এও আমার কল্পনার বাইরে। এ দুটি যেন বিজলী-তৈরী, সাগর-সৈকতের দুটি ঝিনুক মাত্র। এতে সাত ফোঁটা জলও ধরবে কিনা সন্দেহ। মায়ের জগৎ এতই রহস্যময়? আজ আবার একি দেখালে ঠাকুর!''

রামকৃষ্ণদেব সহজ সুরে স্নিগ্ধ হাসি ছড়িয়ে উত্তর

দিলেন—''তা'ত বুঝলাম, কিন্তু এতে জল কই?'' এই বলতে বলতে তিনি যেই ক্ষুদ্র কোশাকুশী দুটিকে উপুড় করে ধরলেন, অম্‌নি তা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় স্নিগ্ধ হিমগিরির কন্‌কনে জল মাটিতে গড়াতে লাগলো। মার্ব্বেল পাথরের মেঝে, মুহূর্ত্ত মধ্যে যেন হিমালয় পাহাড়ের বরফস্তূপ জমা হতে লাগলো। সমস্ত পাথরের মন্দির থেকে বরফের ধোঁয়া বেরুতে লাগলো!

এরূপ অলৌকিক দৃশ্য দেখে, রামকৃষ্ণদেবও আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। অজস্র চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে নরেনকে বললেন—''ওরে! এযে আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না, বসতে পারছি না, আবার শুয়ে পড়তেও পারছি না। এখন পালাব কেমন করে?''

স্বামীজি এ সময় খুবই কেঁপে কেঁপে উঠছিলেন, লক্ষ লক্ষ বরফস্তূপের মধ্যে থেকে যেন একেবারে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে পড়লো। রামকৃষ্ণদেব নিশ্চল এক বরফ-স্তূপের মতই নিস্তব্ধে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ঠিক এই সময়ে রাণী রাসমণি মন্দিরে প্রবেশ করেই বলে উঠলেন, ''একি! মন্দিরে এত বরফের স্তূপ কেন? ঠাকুর কোথা? কে তুমি গৌরীবেশে এ ঘরে শিবের পূজা করছো? রামকৃষ্ণ কোথায় গেলেন?''

পরের মুহূর্তে মথুরবাবু মন্দিরে ঢুকেই উত্তর দিলেন—''একি অদ্ভুত কথা বলছেন রাণী? রামকৃষ্ণদেব তো আপনার সম্মুখেই ধ্যানস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন! আপনার পায়ের কাছে নরেনও ধ্যানস্থ রয়েছেন, তাও কি চোখে পড়ছে না?''

রাণী রাসমণি ক্ষণেক চম্‌কে উঠে ধীর বিনম্র সুরে চোখের জল মুছতে মুছতে উত্তর দিলেন—''না''—

...ক্রমশঃ

চিত্তশুদ্ধি ও আমি ত্যাগ

শ্রীগোবিন্দদাস উদাসী বাবা

এইটি ভাল, এইটি মন্দ, এইটি লাভ, এইটি অলাভ, এইটি সুন্দর, এইটি কুৎসিৎ, এইটি বিষমভাব। এই ভাব যখন থাকে না তখন তাহার চিত্তশুদ্ধ হইয়াছে জানা যায় এবং তাহার সকল মনুষ্যে সকল জীবে সর্ব্বত্র ভগবান তুমিই আছ তাহার ভুল হয় না। সে আর বিষম দেখে না। একই দেখে। যাহা দেখে তাহাতেই—তোমাকেই ভাবনা করে বলিয়া বাহিরের বস্তুকে উপলক্ষ্য করিয়া নিজের অন্তরে প্রবেশ করে। কারণ, ভাবনা কখনও বাহিরে যায় না। ভাবনা নিজের অন্তরের বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিয়া যখন চিত্ত তোমাতে পৌঁছায় তখন বাহিরের তিরস্কার পুরস্কার, বাহিরের সুখ্যাতি অখ্যাতিতে বাহিরের সুন্দর কুৎসিতে, বাহিরের পুরুষে প্রকৃতিতে, বাহিরের শীত গ্রীষ্মে বর্ষায়, বাহিরের তরু লতায়, বাহিরের জলে স্থলে বায়ুতে, বাহিরের শব্দে গন্ধে, বাহিরের রূপে, অন্তরে তুমিই আসিয়া উঠ, তোমাকেই দেখিয়া সব অন্তর ভরপুর হইয়া যায়। রাগ দ্বেষ আর থাকে না। সবই তুমি! সবই আনন্দময় হইয়া যায়।

প্রথম প্রথম শুধু ভাবনাতে ইহার স্মরণ সর্ব্বদা থাকে না। এ জন্য কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিতে হয়। রোগে শোকে তুমি, অন্তরে বাহিরে তুমি, আকাশে তুমি, সমুদ্রে তুমি, বায়ুতে অগ্নিতে তুমি, দুষ্টে শিষ্টে তুমি, পুরস্কারে তিরস্কারে তুমি, কাকে কোকিলে তুমি, সর্ব্ব শব্দে তুমি, সর্ব্ব রূপে তুমি, আহারে বিহারে তুমি, তারপর সারা বিশ্বব্যাপী তুমিই ত আছ। সর্ব্ব সংকল্পে বিকল্পে তুমি, শ্বাস প্রশ্বাসে তুমি, দেখতে শুনতে তুমি, শয়নে স্বপনে তুমি, তুমি ভিন্ন আর কিছুই দেখাচ্ছে না। কর্ম্ম আছে, অহংকর্ত্তা অভিমান নাই। কর্ম্মও তুমি অহংকর্ত্তা অভিমানও তুমি। স্মরণে আমি হারাইয়া যায়। আমি হারাইয়া গেলেই কেবল তোমাকে লইয়া আনন্দ। আমি হারাইয়া গেলেই জগত মধু ও অমৃতময় হয়। কোথাও নিরানন্দ নাই। রাগ দ্বেষ নাই, ইষ্ট অনিষ্ট নাই। আমার সেবায় যেমন সুখ, তোমার সেবাও তেমনি সুখ। নিজে খাইয়া যেমন তৃপ্তি তোমাকে খাওয়ানোও তেমন তৃপ্তি, নিজে সাজিয়া যেমন আনন্দ, তোমাকেও সাজাইয়া তেমনি আনন্দ। যেখানে আপনপর নাই যেখানে সর্ব্বত্র এই কেবল আনন্দের পর আনন্দ হইতে থাকে।